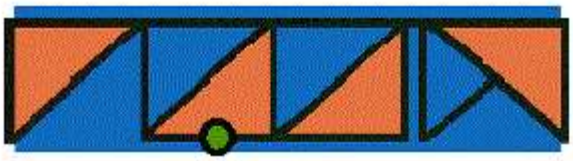

সংখ্যা : ৬৭

বাংলাভাষার ধাতু ও ক্রিয়া, এবং সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্ব

দেবদত্ত জোয়ারদার

প্রেক্ষাপট

ব্যাকরণের আলোচনায় আমরা ধাতুর কথা শুনতে পাই। সংস্কৃতের মতো প্রাচীন ভাষা শিখতে গেলে ধাতুরূপ মুখস্থ করতে হয়। কিন্তু যে ভাষা আমরা উঠতে বসতে ব্যবহার করি তার ক্ষেত্রে আমরা কি ধাতু সম্বন্ধে অবহিত হয়ে কথা বলি বা লিখি? নাকি ক্রিয়াপদ ব্যবহার করতে করতে আমরা বুঝে যাই বিচিত্র ক্রিয়াপদ কীভাবে গঠিত হচ্ছে? সেইভাবে, একটা গভীর নিয়মের স্বাদ কি আমরা অচিরেই পেয়ে যাই ও সেই নিয়মের ওপর একপ্রকার কর্তৃত্ব আমাদের হাতে আসে? (চম্‌স্কি এটাকেই বলেন linguistic competence।[i]) সেই নিয়ম আসলে একটা স্বাভাবিক অথচ সুনির্দিষ্ট গঠনতন্ত্র। স্বাভাবিক, কারণ সেটা ভাষার ওপরে কেউ অনুশাসন হিসেবে চাপিয়ে দেয় নি। সেই সঙ্গে সেটা তার উচ্চারণ বা ধ্বনিতন্ত্রও বটে। এই রূপ (গঠন) ও ধ্বনির তন্ত্র অলঙ্ঘনীয় নয়, তবু সেখানে স্বাভাবিক একটা নিয়মের সৌরাজ্য কায়েম থাকে। তার অর্থ স্থবিরতা নয় কারণ বিবর্তন চলতে থাকে। কিন্তু সেই বিবর্তন ঘটে ওই স্বাভাবিক নিয়মের কাঠামোর মধ্যে। এটাই মানবভাষার প্রকৃতি। এর পাশাপাশি আসে লেখ্য রূপের প্রশ্ন। কথ্য ও লেখ্য দুই মাধ্যমের মধ্যে অন্যোন্য সম্বন্ধ, medium-transferability, সেটাও মানবভাষার গুরুতর দিক। যে মুহূর্তে মুখে-বলা ক্রিয়াপদগুলো পেতে চায় লেখ্য রূপ সেই ভাষার বর্ণমালা অবলম্বন করে, তখন অনিবার্যভাবেই এসে যায় তার বর্ণসংস্থাপন বা বানানের প্রসঙ্গ। সেখানেও কোনো নৈরাজ্য, কোনো অতিরিক্ত অভিনবত্ব, বরদাস্ত হয় না। বরং যেহেতু এই একটি ক্ষেত্র অনেকটাই মানুষের দখলে তাই সেখানে সমতা, সরলতা, সেই ভাষার ধ্বনি ও বর্ণের চিরাচরিত সম্পর্ক, শব্দের ইতিহাসের সঙ্গে যোগ, ও বানান-রূপের স্থায়িত্ব ইত্যাদি প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে।

অতএব, আমাদের মূল আলোচ্যের দিকে তাকালে দেখি, ভাষার মধ্যে ব্যবহার্য রূপে আমরা পাই ধাতু নয়, ক্রিয়াপদ। তাই আদি প্রশ্নটাই হতে পারে, ক্রিয়াপদের গঠনতন্ত্র ও ধ্বনিতন্ত্র আমরা বিশ্লেষণ করব কী উপায়ে। অর্থাৎ, ক্রিয়াপদ যে কোনো অখণ্ড একক নয় তা সহজেই ধরা পড়ে। তাহলে, ক্রিয়াপদ কী কী দ্বারা গঠিত? দু'টি ক্রিয়াপদ যখন দু'টি আলাদা কাজ বোঝাচ্ছে তখন তাদের মধ্যে পার্থক্য কোথায়? আবার, দু'টি ক্রিয়াপদ যখন একই কাজের দু'টি ভিন্ন অবস্থা বোঝাচ্ছে তখনই বা তাদের তফাত কোথায়? ক্রিয়াপদের মধ্যে কী কী ধ্বনিপরিবর্তন ঘটে, ও কোন্ প্রতিবেশে কী কারণে ঘটে? একটি উপভাষার ক্রিয়াপদ যখন বিবর্তিত হয়ে আরেকটি উপভাষার ক্রিয়াপদের জন্ম দেয়[ii] তখন সেই বিবর্তনের গতিপথটা কীরকম? দু'টি আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে পার্থক্যের উৎস কী? এইভাবে প্রশ্নের পর প্রশ্নের শৃঙ্খল রচনা করে আমরা বুঝে নিতে পারি বিষয়ের পরিধি ও আমাদের অনুসন্ধানের লক্ষ্য।

বাংলা ধাতু প্রকরণ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করেছিলেন যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বিগত শতাব্দীর গোড়ায় তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা' নামক গ্রন্থে (প্রকাশ ১৯১২)। ক্রিয়াপদ থেকে তিনি ধাতু নিষ্কাশনের উপায় প্রস্তাব করেছিলেন, বাংলা ধাতুকে

সাতটি শ্রেণি বা গণে বিভক্ত করেছিলেন; ও বিভক্তিগুলোকে চিহ্নিত করেছিলেন সংস্কৃত লট্‌লোটাদির আদর্শে লি, লিনু, লিতুম, লিবু, লুক, লিস ইত্যাদি নামে। ল-বর্ণ তিনি নিলেন 'কাল' (tense) শব্দ থেকে। বাংলা ভাষাতত্ত্বের সেই প্রথম যুগে তাঁর পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ আজও বিস্ময় জাগায়। তিনি যে একটা অভিনব আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন সেটা বুঝতে পারি যখন দেখি সে যুগের বাংলা ভাষাতত্ত্ব ধাতু প্রকরণের বৈজ্ঞানিক বিন্যাস বিষয়ে তত আগ্রহী হয়ে ওঠে নি। বাংলা ভাষাতত্ত্বের অন্যতম দিশারী রবীন্দ্রনাথও এই ক্ষেত্রটি বিশেষ স্পর্শ করেন নি।

বলাই বাহুল্য, বৈয়াকরণ মাত্রেই বাংলা ভাষার ধাতু প্রকরণ আলোচনায় সমান উৎসাহী নন। বিষয়টাকে এড়ানো সম্ভব নয় কোনো ব্যাকরণ গ্রন্থে, কিন্তু কতটা অনুসন্ধান করবেন গ্রন্থকার তা যেন তাঁর নিজস্ব অভিরুচির ব্যাপার। এমনকি সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ও তাঁর অসামান্য গ্রন্থ 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ'-এ (প্রথম প্রকাশ ১৯৩৯) এ প্রসঙ্গে নামমাত্র আলোচনা করেছেন। (তবে তাঁর চিহ্নিত ধাতুমূলগুলো থেকে অনুমান করা যায় তাঁর ধাতু নিষ্কাশনের পদ্ধতি যোগেশচন্দ্রের থেকে আলাদা।[iii]) মোটের ওপর একথা বলা যেতে পারে, ধাতু ও ক্রিয়ার রূপধ্বনিগত (morpho-phonological) আলোচনা যে একটা ব্যাপক সমীক্ষার ক্ষেত্র, তার মধ্যে নিহিত আছে ভাষার অনেক গূঢ় দিক (রহস্য বললেও অত্যুক্তি হয় না), প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণ গ্রন্থাদি থেকে তার তেমন আভাস পায় না ভাষাজিজ্ঞাসু বাঙালি।

যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির প্রায় তিন দশক পরে রাজশেখর বসু এই বিষয়ে নতুন করে মনোযোগ দিলেন। তিনি কোনো ব্যাকরণ বা ভাষাতত্ত্বের বই লেখেন নি, কিন্তু তাঁর 'চলন্তিকা' অভিধানের (প্রথম প্রকাশ ১৯৩৭) পরিশিষ্টে তিনি বাংলা ব্যাকরণের একটি সারসংক্ষেপ প্রস্তুত করেন। তার মধ্যে প্রধান অংশ জুড়ে 'ক্রিয়ারূপ' নামক অধ্যায়টি বাংলা ধাতু ও ক্রিয়া ব্যাপারে বিস্তৃত অনুসন্ধান। তাঁর এই সমীক্ষার অসামান্য দিক – বাংলা ধাতুকে তাদের গঠন অনুসারে কুড়িটি গণে বিভক্ত করা। যোগেশচন্দ্র করেছিলেন সাতটি গণ। রাজশেখরের এই গণবিভাগ নিখুঁত ছিল কারণ আজ অবধি তাতে গণের সংখ্যায় কম-বেশি ধরা পড়ে নি। গণবিভাগের পর তিনি প্রতিটি গণের একটি আদর্শ ধাতু বা paradigm ধরে বিভিন্ন পুরুষ ও কালে তার রূপগুলো তালিকাবদ্ধ করেছেন। সেই সঙ্গে তালিকা দিয়েছেন সেই গণের অন্তর্গত সমস্ত বা অধিকাংশ ধাতুর। এত গভীর তাঁর দৃষ্টি যে ছিটকায়/ছিটকোয় ওলটায়/উলটোয় জাতীয় বিকল্প যেখানে বিদ্যমান তারও কোনো কিছুই তাঁর নজর এড়ায় নি। এইভাবে প্রায় ৮০০ ধাতু তিনি শনাক্ত করে গেছেন।

বাংলা অভিধানকারেরা সাধারণত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য বা কৃদন্ত পদকে (যেমন, খাওয়া, পালটানো) অভিধানে ক্রিয়ার মুখশব্দ হিসেবে ব্যবহার করেন, রাজশেখরও তা-ই করেছেন। বস্তুতপক্ষে, এগুলোই বাংলাভাষায় ধাতু বা ক্রিয়ার citation form বা উল্লেখরূপ। কিন্তু ক্রিয়ারূপ যে অভিধানের ও ভাষাশিক্ষার অচ্ছেদ্য অঙ্গ এ ব্যাপারে রাজশেখরের যে যত্ন তা অন্য অভিধানকারদের মধ্যে চোখে পড়ে না। বিষয়টার অনন্ত সম্ভাবনা তুলে ধরেছেন রাজশেখর। তাঁর ধাতু ও ক্রিয়ারূপের অধ্যায় যেন একটা বিস্তীর্ণ মানচিত্রের মতো, যাতে এলাকার সীমানাটা ঠিক ঠিক আঁকা হয়েছে, প্রধান নদী ও পাহাড়গুলো চিহ্নিত হয়েছে। কিন্তু এই অবধি এসে, অর্থাৎ রাজশেখরের কাছ থেকে পাথেয় সংগ্রহ করে, তাঁর পৌঁছোনো স্তর থেকে একটা নতুন সমীক্ষা শুরু হতে পারে। রাজশেখর (এবং যোগেশচন্দ্রও) আরম্ভ করেছিলেন ধ্বনি থেকে – তাঁর গণবিভাগ ধাতুর অন্তর্গত স্বরধ্বনির ভিত্তিতে। কিন্তু এই সূচনাটার পরে ধ্বনি বিষয়ে তিনি নীরব। তাঁর বাকি আলোচনা ক্রিয়াপদের গঠনভিত্তিক। লেখ্য রূপগুলো তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন। অথচ তাদের উচ্চারণ তিনি নির্দেশ করেন নি। উচ্চারণ নির্দেশ করলে ধ্বনির যে বিচিত্র ওঠানামা চলছে তা নজরে আসে; তাও অনুল্লিখিত। সাধু ও চলিত দু'টি ভিন্ন রূপ হিসেবে পরিবেশিত; সাধু থেকে চলিতে বিবর্তনের সম্বন্ধটা আঁকা হয় নি। তাঁর বিবৃত ক্রিয়ারূপের প্রতিটি পদ যে ধ্বনিগত বিশ্লেষণের দাবি করে তা তাঁর আলোচনার বাইরে থেকে গেছে।

কিন্তু আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান ভাষার ধ্বনিকেই তার মূল অনুধ্যেয় রূপে গ্রহণ করেছে। লিপির থেকে কণ্ঠোচ্চারিত ধ্বনি যে বেশি মৌলিক তা নিয়ে এ বিজ্ঞানে কোনো সংশয় নেই। সাবেকি ব্যাকরণের নজর ছিল লিখিত সাহিত্যিক ভাষা, এখনকার বিজ্ঞানের নজর সর্বগ্রাসী ও মূলত কথ্য ভাষা। বাংলা ক্রিয়ার প্রতিটি ধ্বনি তাই কৌতূহলের বস্তু হতে পারে। লিখ্-ধাতুর ই-

কার থেকে কী করে লেখে-র এ-কার এল; হইতেছিল থেকে হচ্ছিল, অথচ করিতেছিল থেকে করছিল; খাইয়া থেকে খেয়ে, অথচ করাইয়া থেকে করিয়ে; হইবে থেকে হবে, কিন্তু একটার উচ্চারণ হোইবে, অন্যটার হ-বে, অথচ করিবে থেকে করবে-র উচ্চারণ কোর্‌বে – এইরকম প্রতিটি ব্যাপার ধ্বনিগত আলোচনার যোগ্য বিষয়। সে আলোচনাও বিস্তর হয়েছে বাংলাভাষায়। স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি ও অভিশ্রুতি – যথাক্রমে vowel harmony, epenthesis ও umlaut নামে তিনটি ধ্বনিগত প্রক্রিয়ার বাংলা পরিভাষা প্রস্তাব করেছিলেন সুনীতিকুমার[iv] (বাংলা ১৩৩৬)। তা দিয়ে দেখানো গেছে ধ্বনিবিবর্তনের একপ্রকার পরম্পরা। যেমন, লিখ্-ধাতু থেকে লেখে (ই > এ) স্বরসঙ্গতি; করিতেছিল > কইর্‌তেছিল অপিনিহিতি থেকে পর্যায়ক্রমে করছিল; খাইয়া > খেয়ে অভিশ্রুতি।

ধ্বনি পরিবর্তনের এই প্রকার বিবৃতির বৈশিষ্ট্য হল তা মূলত input/output-এর আকারে বিবর্তনটা পেশ করে, এবং কিছু কারণ নির্দেশ করে (যেমন, স্বরসঙ্গতিতে উচ্চ/নিম্ন স্বরের প্রভাবে পার্শ্ববর্তী স্বরের ঊর্ধ্ব/নিম্নগতি)। বিশেষত, অভিশ্রুতিকে আভ্যন্তর সন্ধি বলে চিহ্নিত করে দুই বা তিন ধাপের বিবর্তন এক ধাপে প্রকাশ করে। বহুস্তর ও ক্রমিক একটি পরিবর্তনকে ক্রমান্বয়ে ধরতে না পারা এই প্রণালীর দুর্বলতা। সে সময়ের ধ্বনিবিজ্ঞান এই অবধিই এগোতে পেরেছিল - ধ্বনির কোনো মৌলিক ধর্মের ক্রিয়া হিসেবে এইসব পরিবর্তনের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম ছিল না। একাধিক ধ্বনিপরিবর্তন এক ধাপে ঘটে না। কিন্তু এমন কোনো প্রণালী তখন ছিল না যার দ্বারা একটি ক্রমবিবর্তনকে তার প্রতিটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে দেখানো সম্ভব হয়।

কোনো বিজ্ঞানই মৌলিকতম কার্যকারণে পৌঁছোতে না পারলে তৃপ্ত থাকে না। তাই এই অবস্থা থেকে একটা যুগান্তর শুরু হল পাশ্চাত্যে। প্রথমে প্রস্তাবিত হল phoneme[v] বা ধ্বনিমূলের তত্ত্ব। Phoneme-এর বাংলা নাম এখন **স্বনিম**। ভাষার মৌলিক ধ্বনিগুলো (speech-sounds) হল স্বনিম। যেমন, ক্ এই কণ্ঠ্যব্যঞ্জন নানা ভাষাতেই একটি স্বনিম। স্বনিমকে দেখানো হয় দু'টি slash চিহ্নের মাঝখানে একটি বর্ণ (ধ্বনিচিহ্ন) দিয়ে। ক্-ধ্বনিকে স্বনিম হিসেবে দেখানো যেতে পারে /ক্/ বা /k/ রূপে। সব স্বনিম সব ভাষায় নেই। যেমন, বাংলা বক বা ইংরেজি mock শব্দের /অ/ স্বনিমটি হিন্দীভাষায় নেই। একটি স্বনিমের উপস্থিতি একটি ভাষায় থাকলেও তার বর্ণমালায় তা নাও থাকতে পারে। যেমন, বাংলা এক শব্দের বা ইংরেজি bat শব্দের /অ্যা/ স্বনিমটি বাংলা ভাষায় আছে কিন্তু বাংলা বর্ণমালায় নেই। একটি ভাষায় স্বনিমের সংখ্যা নির্দিষ্ট, সেগুলি শনাক্ত করে নিলে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সুবিধে হয়। স্বনিমতত্ত্বের শক্তি হল, সামান্য এক ঝাঁক মৌলিক ধ্বনি-এককের নিরিখে ভাষার অসীম অনন্ত ধ্বনিশৃঙ্খল বা শব্দাবলীকে প্রকাশ করবার ক্ষমতা। ভৌত বিজ্ঞানাদিতে atomic theory-র মতো গুরুত্বপূর্ণ বলা চলে তাকে।

স্বনিমেরা জোড় বাঁধে, অথবা একে অপরকে প্রভাবিত করে। কিন্তু তারও কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। সংস্কৃত/বাংলায় গ্লানি কিংবা ইংরেজি glance শব্দ শুরু হয় /g/ + /l/ যুক্তব্যঞ্জনধ্বনি দিয়ে, কিন্তু /l/ + /g/ দিয়ে কোনো শব্দ শুরু হতে পারে না। এটা জোড় বাঁধার স্বাভাবিক একটা সীমাবদ্ধতা, যার নাম systematic gap। আবার, আকস্মিক সীমাবদ্ধতা বা accidental gap-ও আছে। যেমন, /s/ + /চ্/ জোড় বাঁধতেই পারে, কিন্তু সংস্কৃত/বাংলায় বাঁধে না – বেশির ভাগ বাঙালি question-কে উচ্চারণ করেন কোশ্চেন। কিন্তু চাইলে কোএস্‌চেন-ও উচ্চারণ করতে পারেন, কারণ /s/ + /চ্/ কোনো অসম্ভাব্য জোড় নয়। পশ্চিম শব্দের একটু অ-মান্য উচ্চারণ পস্‌চিম তো শোনাই যায়। অন্যদিকে, /ই/ স্বনিমের প্রভাবে বাংলা /অ/ হয়ে যায় /ও/ (স্বরসঙ্গতি), অতি উচ্চারণ ওতি; কিন্তু /ও/ কোনো প্রভাব ফেলতে পারে না /অ/-এর ওপর, কও-এর উচ্চারণে /অ/ অবিকৃত। এগুলো কেন হয়? কেন এই সম্ভাব্যতা ও অসম্ভাব্যতা? এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে প্রস্তাবিত হল distinctive feature বা **স্বলক্ষণ**-এর তত্ত্ব। প্রথম প্রস্তাব করেন রোমান ইয়াকবসন (Roman Jakobson) ও মরিস হ্যালি (Morris Halle), সন ১৯৫৫। তার অল্পকাল পরেই (১৯৬৮) চম্‌স্কি ও হ্যালির হাতে, The Sound Pattern of English গ্রন্থে (সংক্ষেপে SPE) তার পূর্ণ প্রয়োগ ও পরিণতি ঘটে।

এই তত্ত্বে দেখানো হল, স্বনিমের থেকেও মৌলিক স্তরে রয়েছে ধ্বনির কিছু বিশিষ্ট লক্ষণ, তাদেরই সমবায়ে গড়ে ওঠে একেকটি স্বনিম। যেমন, স্বরধ্বনিগুলোর একটি স্বলক্ষণ হল তারা মাত্রা বা syllable গঠন করতে পারে। তাই তাদের এই স্বলক্ষণটির নাম syllabic। এই লক্ষণটি যে স্বনিমের আছে তা দেখানো হয় [+syllabic] রূপে। অধিকাংশ ব্যঞ্জনধ্বনির তা নেই (ক্ষেত্রবিশেষে, যেমন ইংরেজি brittle শব্দের অন্তিম l-এর মতো ব্যতিক্রম ছাড়া), তাই তারা [-syllabic], অর্থাৎ বিয়োগ চিহ্নে অঙ্কিত। প্রতিটি স্বনিমে একাধিক স্বলক্ষণের অস্তি-নাস্তি। যোগ (+) ও বিয়োগ (–) চিহ্ন দ্বারা স্বলক্ষণগুলি সূচিত করে কীভাবে স্বনিম প্রদর্শিত হয় গণিতের column matrix হিসেবে তার তিনটি নমুনা নিচে পেশ করা গেল।

$$\begin{bmatrix} \text{ই} \\ +syllabic \\ -consonantal \\ +high \\ -back \\ -round \\ -tense \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \text{প্} \\ -syllabic \\ +consonantal \\ -voiced \\ -continuant \\ +labial \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} \text{ব্} \\ -syllabic \\ +consonantal \\ +voiced \\ -continuant \\ +labial \end{bmatrix}$$

এখানে কেবল প্রধান স্বলক্ষণগুলি দেখানো হয়েছে।

স্বলক্ষণ অনেক রকম আছে, যে ক'টির সাহায্যে স্বনিমটিকে শনাক্ত করা যাবে সেগুলি ছাড়া বাকিগুলোকে বাহুল্য জ্ঞানে ত্যাগ করা হল। এখানে /ই/-এর distinctive feature matrix থেকে বোঝা যাবে, স্বনিমটি স্বরবর্ণ [+syllabic] ও [-consonantal], উচ্চ [+high] ও সম্মুখ [-back] ধ্বনি, অবর্তুল [-round], ও হ্রস্ব [-tense]। /প্/ ও /ব্/, আমরা জানি, দুটোই স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন (যাতে মুহূর্তের জন্য শ্বাসপ্রবাহ রুদ্ধ হয়) ও ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন; কিন্তু /প্/ অঘোষ ধ্বনি আর /ব্/ তার ঘোষ সহোদর। অতএব, /প্/-এর matrix থেকে বোঝা যাবে, স্বনিমটি ব্যঞ্জন, [-syllabic] ও [+consonantal], এবং অঘোষ [-voiced], তদুপরি স্পৃষ্ট [-continuant[vi]], ও ওষ্ঠ্য [+labial]। /ব্/-এর matrix–এ দেখা যাচ্ছে স্বনিমটি ঘোষ [+voiced]; বাকি স্বলক্ষণ /প্/-এর সমান।

এইভাবে মোট আঠারো-উনিশটি স্বলক্ষণের সাহায্যে ভাষার পঞ্চাশ-ষাট বা ততোধিক স্বনিমকে প্রকাশ করা সম্ভব। উপরন্তু, এগুলো যেহেতু লক্ষণ মাত্র, তাই এরা ভাষানিরপেক্ষ, অর্থাৎ এরা সার্বত্রিক বা universal। সুতরাং এরা language universals-এর মধ্যে গণ্য হয়েছে। একটি ভাষায় একটি স্বনিম আছে অথবা নেই তা নির্ভর করবে নানা স্বলক্ষণের সমবায়-সম্ভাবনার ওপর। এই সীমাবদ্ধতার পারিভাষিক নাম simultaneous constraints। কিন্তু সে ভিন্ন প্রসঙ্গ। আলোচ্য প্রসঙ্গে আমরা বেশি আগ্রহী ধ্বনি পরিবর্তন নিয়ে। স্বলক্ষণ তত্ত্ব দেখাতে সক্ষম ধ্বনি পরিবর্তনও কীভাবে পরিবর্তনীয় ধ্বনির স্বলক্ষণ ও তার প্রতিবেশী ধ্বনির স্বলক্ষণের ওপর নির্ভর করে। বর্তমান আলোচনায় এই দিকটিই বেশি কাজে লাগবে।

স্বরসঙ্গতি অভিশ্রুতি ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় আমরা দেখতে পাই একটি স্বনিম পার্শ্ববর্তী অন্য স্বনিমের প্রতিবেশে ভিন্ন কোনো স্বনিমে রূপান্তরিত হচ্ছে। স্বলক্ষণ তত্ত্ব এর গভীর বিশ্লেষণে সাহায্য করে। দেখা যায়, স্বনিমটি তার প্রতিবেশী স্বনিমের প্রভাবে কিছু স্বলক্ষণ প্রাপ্ত হয়ে এবং/বা কিছু স্বলক্ষণ হারিয়ে অন্য স্বনিমে পরিবর্তিত হচ্ছে। এই রূপান্তর দেখানো হয় এইভাবে –

- যদি পূর্ববর্তী ধ্বনির প্রভাবে পরিবর্তন হয় – [মূল ধ্বনি] ⟶ [পরিবর্তিত ধ্বনি] / [প্রতিবেশী ধ্বনি] ------
- যদি পরবর্তী ধ্বনির প্রভাবে পরিবর্তন হয় – [মূল ধ্বনি] ⟶ [পরিবর্তিত ধ্বনি] / ------- [প্রতিবেশী ধ্বনি]
- যদি দু'দিকেরই ধ্বনির প্রভাবে পরিবর্তন হয় – [মূল] ⟶ [পরিবর্তিত] / [প্রতিবেশী] ----- [প্রতিবেশী]
- যদি ধ্বনিটি লুপ্ত হয়ে যায় তাহলে [পরিবর্তিত] স্থলে একটি পেটকাটা শূন্য চিহ্ন ϕ বসানো হয়।

এইভাবে একটি শব্দ বা ধ্বনিশৃঙ্খলের উপরিতল থেকে, ধ্বনিসংগঠনের মৌলিক থেকে আরও মৌলিক স্তরে পৌঁছে, খণ্ড ও উপখণ্ড ধরে ধরে কার্যকারণ বিশ্লেষণ ও বিবৃতির যে প্রণালী তা generative phonology বা **সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্ব**-এর প্রণালী। এই নিবন্ধের প্রস্তাবিত আলোচনায় সেই প্রণালী যথাসাধ্য বিশদভাবে ব্যবহার করা হবে।

ধাতু ও ক্রিয়া সংক্রান্ত সামগ্রিক আলোচনার আধেয় বস্তু যা হওয়া উচিত বলে আমরা মনে করছি তার কিছুটা স্পর্শ ও পূর্বাস্বাদ পাওয়া যায় পবিত্র সরকারের 'বাংলা একশাব্দিক ক্রিয়া' নিবন্ধে[vii]। দীর্ঘ পথ এই নাতিবৃহৎ নিবন্ধে তিনি যাত্রা করেছেন। পূর্বগামীদের প্রয়াসকে পুনর্বিন্যাস করা তাঁর লক্ষ্য, এবং তাঁর প্রণালী মূলত রূপধ্বনিভিত্তিক। তবু আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞানের, বিশেষত সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্বের, প্রণালী তিনি পূর্ণ মাত্রায় প্রয়োগ করেন নি, হয়তো ওই সংকলনের পরিসরে তা সম্ভব ছিল না। তার ছোঁয়া এসেছে তাঁর 'সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্ব' নামক নিবন্ধে[viii]। তবে সেই নিবন্ধের প্রধান লক্ষ্য সঞ্জননী ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়টি, বাংলা ক্রিয়া নয়।

আমাদের আলোচনাও হবে রূপধ্বনিভিত্তিক। রূপ ও রূপখণ্ড (morpheme) অতি কৌতূহলের বস্তু; ধাতু ও বিভক্তি তো তার মধ্যেই পড়ে। কিন্তু আমাদের বিশেষ ঝোঁকটা থাকবে ধ্বনিগত (phonological) দিকের ওপর। ধাতু ও ক্রিয়ার বিপুল ক্ষেত্রের পূর্ণাঙ্গ সমীক্ষা বিপুল পরিসর দাবি করে। তার রূপ, ধ্বনি, অর্থ, প্রয়োগ ও বাগ্‌ধারার বৈশিষ্ট্য অসংখ্য। তা নিয়ে একটি আনুপূর্বিক অন্বেষণ সত্যিই জরুরি। আমরা সেই সুবিশাল অন্বীক্ষায় প্রবৃত্ত হব না। আমরা সীমাবদ্ধ থাকব কতিপয় ধাতু ও ক্রিয়ার রূপধ্বনি নিরীক্ষণে, চেষ্টা করব তার মাধ্যমে সমগ্র জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হতে। এখানে যে তত্ত্বভিত্তির একটা ছোটোখাটো রূপরেখা আঁকা গেল তার কিছু লাভ নিশ্চয় আছে। তা ছাড়া, এই আলোচনা বানানের অনেক অনাবশ্যক বিভ্রান্তির ওপর আলোকপাত করতে পারে, আমরা তার সদ্‌ব্যবহার করব। কিন্তু সব মিলিয়ে গুরুতর অসম্পূর্ণতা নিয়েই আমাদের শেষ করতে হবে।

❖

(পরের অংশে যাওয়ার জন্যে বিষয়সূচিতে ফিরুন)

(পরবাস ৬৭, জুন ২০১৭)

টীকা ও উল্লেখপঞ্জি

[i] One fundamental factor involved in the speaker-hearer's performance is his knowledge of the grammar that determines an intrinsic connection of sound and meaning for each sentence. We refer to this knowledge – for the most part, obviously, unconscious knowledge – as the speaker-hearer's "competence". *The Sound Pattern of English, Noam Chomsky & Morris Halle, Chapter I, Harper & Row Publishers, 1968.* চম্‌স্কি অবশ্য competence-এর কথা নানা উপলক্ষ্যে নানা জায়গায় বলেছেন। এখানে তার একটি সূত্র থেকে উদ্ধৃত হল।

[ii] যেমন বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে সাধু ও এখনকার মান্য চলিত রীতিকে বলা যেতে পারে দু'টি উপভাষা। প্রথমটি থেকে বিবর্তিত হয়ে দ্বিতীয়টির উদ্ভব। এ নিয়ে বিশদ আলোচনা পুরো নিবন্ধ জুড়েই থাকবে। আবার, মান্য চলিত বাংলার মধ্যেও একাধিক উপভাষা বিরাজ করতে পারে। যিনি গেলায়/ভেজায় ইত্যাদি বলেন/লেখেন আর যিনি গিলোয়/ভিজোয় ইত্যাদি বলেন/লেখেন তাঁরা আসলে মান্য চলিত বাংলার দু'টি সমান্তরাল উপভাষা ব্যবহার করেন।

[iii] যেমন, যোগেশচন্দ্রের মতে √দি-ধাতু ও √শু-ধাতু; সুনীতিকুমারের মতে √দে-ধাতু ও √শো-ধাতু। ধাতু নিষ্কাশনের নানা পদ্ধতির আলোচনা দ্রষ্টব্য।

[iv] সুনীতিকুমারের ‘স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি’ নামক প্রবন্ধ, বাংলা ১৩৩৬- তথ্যসূত্র, ‘ভাষাচর্চা একটি সমীক্ষা পরিষৎ-পত্রিকার প্রবন্ধ অবলম্বনে’, প্রবন্ধ, জ্যোতিভূষণ চাকী, শতবর্ষ পরিক্রমা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৬

[v] যতদূর জানা যায়, phoneme শব্দটি প্রথম প্রস্তাব করেন শৌখিন ভাষাতাত্ত্বিক Antoni Dufriche-Desgenettes (১৮০৪ – ৭৮), কিন্তু আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে phoneme-কে একটি শক্তিশালী তত্ত্বে রূপান্তরিত করেন ভাষাতত্ত্বের প্রাগ গোষ্ঠীর (Prague School) Nikolai Trubetzkoy বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে।

[vi] স্পৃষ্ট হলেও যে ধ্বনি উচ্চারণের সময় শ্বাসপ্রবাহ পুরোপুরি রুদ্ধ হয় না সেগুলি [+continuant] – যেমন, /র়/, /শ়/।

[vii] শ্রদ্ধালেখমালা সুকুমার সেন শতবর্ষ স্মারক সংকলন, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০৩

[viii] চম্‌স্কি ব্যাকরণ ও বাংলা বানান, প্রবন্ধ সংকলন, পবিত্র সরকার, পুনশ্চ, ২০১৩

© 1997 - 2017, Parabaas, Inc. All rights reserved.